পরিবেশ ঘিরে রাজনীতি

অরুণাভ মিশ্র

আসুন প্রথমে একটু ভূগোলটা পড়ে নিই। বিশ্বোর ভূগোল। একটাই জীবময় গ্রহ আমাদের সৌরমন্ডলে। প্রাণ বৈচিত্র্যে ভরপুর। সবুজ বনভূমি তার সম্পদ। সাগরে নদীতে তার জলের অবিরল ধারা। বরফমোড়া পাহাড় উঁকি দেয় তার স্থলভাগে। কোথাও সমতলভূমি কোথাও আবার ন্যাড়া পাহাড় আর মালভূমি। মাটির তলায় অজস্র সম্পদ সেই গ্রহের। মাটির উপরে জানা অজানা হরেক গাছপালা, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ মিলিয়ে বিপুল প্রাণসম্ভার। আর সে গ্রহে আছে মানুষ। যারা চিন্তা করতে পারে, যারা সমাজবদ্ধ। যারা বদলেছে এই গ্রহটাকে একরকম করে। বদলে দিতে পারে আবারও। সেই গ্রহ হল আমাদের পৃথিবী।

আমাদের পৃথিবী দেখতে গোল, প্রায় একটা ফুটবলের মতো। তার মাঝখান দিয়ে গেছে বিষুবরেখা। বিষুবরেখা গেছে এশিয়া মহাদেশের সুমাত্রার ওপর দিয়ে, আফ্রিকার কেনিয়া আর জাইরের পেট ছুঁয়ে। দক্ষিণ আমেরিকা আর ইকুয়েডরের মধ্য দিয়েও গেছে সেই রেখা। এই রেখা দু'ভাগে ভাগ করেছে পৃথিবীকে। উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধ। বেশিরভাগ দেশই উত্তর গোলার্ধে। আফ্রিকার কয়েকটি দেশ, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা - ব্রাজিল - বলিভিয়া প্রভৃতি কিছু দেশ আর প্রায় গোটা অস্ট্রেলিয়াটাই দক্ষিণ গোলার্ধে। দক্ষিণ অংশের দেশগুলো অনুন্নত। বা উন্নয়নশীল। তুলনায় উন্নত দেশগুলো বেশিরভাগই উত্তর গোলার্ধের উত্তর অংশে। আমাদের এশিয়া মহাদেশের গোটা উত্তর অংশ জুড়েই প্রায় রাশিয়া একটি বড় উন্নত দেশ। জাপানও উত্তরে। আবার ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশের উত্তর গোলার্ধে হয়েও দক্ষিণে। ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যান্ড, ইতালি প্রভৃতি উন্নত দেশগুলো সহ গোটা মহাদেশটাই একদাম উত্তর ঘেঁষা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার অবস্থান উত্তরে। তুলনায় অনুন্নত লাতিন আমেরিকার দেশগুলো, যাদের আমরা চিনি— গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি নামে তারা রয়েছে উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ ঘেঁষে। তাই ধনী আর উন্নত দেশ বোঝাতে 'উত্তরের দেশ' আর গরিব বা উন্নয়নশীল দেশ বোঝাতে 'দক্ষিণের দেশ' কথাগুলো ব্যবহার করা হয়। এর মানে কখনোই উত্তর গোলার্ধের আর দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ নয়। বরং বলা যায় পৃথিবীর মহাদেশগুলোর উত্তর অংশের আর দক্ষিণ অংশের দেশ। পরিবেশ নিয়ে আলোচনায় এই উত্তর আর দক্ষিণের বিতর্ক বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। উত্তরের দেশগুলো নানা ছল চাতুরির শিকার হয়ে পড়ছে দক্ষিণের উন্নয়নকামী দেশগুলো তাই এই ভূগোল পাঠটুকুর অবতারণা। দক্ষিণের এই দেশগুলো 'তৃতীয় বিশ্বের নামেও পরিচিত।

বিজ্ঞান - উন্নয়ন ও পরিবেশ

আমরা জানি বিজ্ঞান হল প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর রহস্য খুঁজে বের করার জ্ঞান। এই জ্ঞান আমরা আহরণ করে চলি অবিরত। আর প্রকৃতির রহস্যও অপার। তাই বিজ্ঞানের পথও অবিরাম গতিময়। বিজ্ঞান শুধু প্রকৃতির রহস্য খুঁজে বের করে না, তাকে মানুষের জীবনযাত্রা আরও সুখকর, আরও স্বাচ্ছন্দ্যময়, আরও দীর্ঘমেয়াদী করে তোলার জন্য ববেহৃত হয়। মানবজাতির কল্যাণই বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য। মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহৃত হয় বলেই সভ্যতা এগোয়। সমাজের উন্নয়ন, প্রগতি আসে। বিজ্ঞানী আর সমাজবিজ্ঞানীরা একথা অনেকবার বলেছেন। ল্যাভয়সিয়র বলেছিলেন, ''প্রকৃতি ও সমাজের যা কিছু মানবজাতির ক্ষতিকর সেগুলিকে কমাতে বা দূর করতে, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও সুখী করতে সে (বিজ্ঞান) আশা করতে পারে। যে নতুন পথ সে খুঁজে পেয়েছে তা যদি মানুষের গড় জীবনকালকে এমনকি একটি দিনও দীর্ঘায়িত করতে পারে, তবে সে মানবজাতির উপকারী বন্ধু হিসেবে গৌরবান্বিত বোধ করতে পারে।'' প্রায় একইরকম কথা ছিল বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী স্থালিনের। ১৯৩৮ সালের ৮ই মে ক্রেমলিনে, ''সেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হোক যে বিজ্ঞান জনতা থেকে দূরে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না, যে বিজ্ঞান মানুষ ও তার প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন নয়, যে বিজ্ঞান তার সমস্ত প্রাপ্তি ও ফলাফলকে নিয়োজিত করতে চায় বাধ্যতামূলকভাবে নয়, স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে, মুক্তমনে।''

মানবকল্যাণই তাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। উৎপাদনের জন্য সভ্যতার নানা পর্বে সে নেয় উৎপাদনের জন্য নানা পথ। এগুলিই প্রযুক্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরাধরি করে চলার পথে ক্রমে বিকশিত হয় সভ্যতা। কিন্তু প্রযুক্তি যা কিছু তৈরি করে তার কাঁচামাল সে নেয় প্রকৃতি থেকেই। প্রাকৃতিক পদার্থে যুক্ত হয় মানুষের শ্রম। উৎপন্ন হয় নতুন বস্তু। এসব কথা অনেক আগে বলে গেছেন আর এক সমাজবিজ্ঞানী— কার্ল মার্কস। সেই নতুন বস্তু তৈরি প্রকৃতিতে বা পরিবেশে তিনভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। প্রথমত, প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণের ফলে শূন্যতা তৈরি করে, দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিতে 'নতুন বস্তু' যুক্ত করে এবং তৃতীয়ত, 'নতুন বস্তু' বা 'পণ্য' তৈরির সময় যা উপজাত বা বর্জ্য তৈরি হল প্রকৃতিতে তাতে যুক্ত করে। সুতরাং উন্নয়ন সবসময়েই পরিবেশে এই তিনভাবে ছাপ ফেলবে। একে এড়িয়ে কখনো সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয়। আবার একথাও ঠিক যে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন পরিবেশকে সুন্দর করার একটা পথ। মনে হতে পারে এই দুই কথার মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। তা কিন্তু ঠিক নয়। উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে বিক্রিয়া করতে হবে এটা যেমন ঠিক, তেমনি এর ফলে পরিবেশে কত কম ছাপ ফেলা যায় সেটা দেখাও কর্তব্য। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, প্রকৃতিকে ব্যবহারের মাত্রা আমাদের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে সমাজের বা বিশ্বের নিয়ন্ত্রক যারা তাদের মর্জির উপর। তারা যদি বিশ্বের মানুষের কল্যাণের কথা না ভেবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে, নিছক নিজেদের জন্য আরও বেশি সম্পদ, আরও বেশি লাভালাভ—এই লক্ষ্যে পরিচালিত হয় তবে পরিবেশের ওপর বড় বেশি আঘাত আসে। এত বেশি সম্পদ তখন প্রকৃতি থেকে এত অল্প সময়ে তুলে নেওয়া হয় যে প্রকৃতি সেই শূন্যতা সহজে ভরাট করতে পারে না। অনেক 'নতুন বস্তু' পরিবেশকে দ্রুত বদলে ফেলে। বর্জ্য পদার্থ জমে যায় পরিবেশে ত্বরিৎ গতিতে। তার ফলে পরিবেশ বদলে যায়। তা আর মানুষের জন্য কল্যাণকর জায়গায় থাকে না। এই সহজ সত্যটিকে প্রথমেই বুঝে নিতে হবে।

পণ্য সব্যতাই পরিবেশকে বিষিয়ে দিচ্ছে

বিশ শতকের শুরু থেকেই আমরা দেখছি পুঁজি নির্ভর সমাজব্যবস্থার ক্রমবিকাশ। একসময় এই বেশি পুঁজির দেশগুলো অন্য দেশগুলোকে উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছিল। উপনিবেশ দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে তারা ভোগ্যপণ্যও ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে নিজেদের দেশ ও উপনিবেশ দেশগুলোর প্রয়োজন মেটাতো। কম দামে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আর বেশি দামে উৎপন্ন নতুন বস্তু বিক্রি করে তাদের সম্পদ আরও বাড়লো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় পুঁজিনির্ভর উন্নত উত্তরের দেশগুলো তাদের কৌশল বদলালো। নানা শর্তে নতুন স্বাধীন দেশগুলোকে তারা দিতে শুরু করলো ঋণ। আর ঋণের সুদ মেটাতে আবারও ঋণ। এই ঋণ-জালের সঙ্গে তাদের পরিত্যক্ত, যা পরিবেশের পক্ষে অনেক বেশি ক্ষতিকর, তাকে রপ্তানি করতে লাগলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। এতে তাদের পুঁজি আরও স্ফীত হল। উত্তরের এই ধনী দেশগুলো তখন তাদের দেশের মানুষের জন্য আরও নতুন নতুন ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনী দ্রব্য, খাবার দাবার, তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল, চাষবাসের নানা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে লাগলো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে তারা তাদের লাভের স্বার্থে ব্যবহার করলো। তাদের দেশের বাজারের প্রয়োজন মিটিয়ে এই পণ্য যাতে তৃতীয় বিশ্বের

বাজারেও অবাধে আসতে পারে তাই তারা নিয়ে এল 'বিশ্বায়নের' ধারণা। এই বিশ্বায়ন ধনীদের আরও ধনী করবে, গরিবদের করবে আরও গরিব। পুঁজি নির্ভর দেশগুলোর পুঁজি বাড়িয়ে নেওয়ার নতুন কৌশল এই 'বিশ্বায়ন'। বিশ্বায়নের ছাতার সুযোগে উত্তরের ধনী দেশগুলোর বড় বড় কারখানায় তৈরি হওয়া টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন, ঘর ঠান্ডা করার যন্ত্র। মোটর গাড়ি, রেল ইঞ্জিন, টেলিফোন থেকে শুরু করে গৃহস্থলির জিনিস, প্রসাধন, সার, ওষুধ, বীজ প্রভৃতি হরেক জিনিস আসবে তৃতীয় বিশ্বের বাজারে। এসব তৈরির জন্য লাগবে অনেক শক্তি। সেসব কারণে আর গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান মেটাতে পুড়ছে কয়লা, পেট্রল, গ্যাস। ব্যবহৃত হচ্ছে পারমাণবিক শক্তিও। আর পুঁজির সুরক্ষার জন্যও যেমন, তেমনি পড়শি দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ জিগির জিইয়ে রেখে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র শিল্প। সব মিলিয়ে ব্যাপকভাবে প্রকৃতির ওপর আঘাত আসছে। এসবই কিন্তু সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ভাবনায় হচ্ছে না—হচ্ছে মুষ্টিমেয়র স্বার্থে। একটি ছোট পরিসংখ্যান বিষয়টিকে স্পষ্ট করবে। ভোগ্যপণ্য ব্যবহারে আজ ধনী ২০ শতাংশ দেশ আর গরিব ২০ শতাংশ দেশের তুলনামূলক চিত্র থেকে পরিষ্কার, বোগ্যপণ্যের অসম ব্যবহারই আজকের পরিবেশের সমস্যাকে প্রকট করেছে।

ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার বিষয়ে ১৯৯৮ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট

পণ্য	সর্বাধিক ধনী ২০	সর্বাধিক গরিব ২০
মাংস ও মাছ	৪৫%	৫%
শক্তি	৫৮%	৪%
টেলিফোন	৭৪%	১.৫%
কাগজ	৮৪%	১.৫%
গাড়ি	৮৭%	১.০%

উত্তরের দেশগুলোর তাই ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বেশি, ব্যবহারও বেশি। প্রকৃতিকে তারাই নিঃস্ব করেছে সর্বাধিক। বর্জ্যও প্রায় সবটাই তাদেরই তৈরি করা। আর তারাই পরমাণু অস্ত্রে হিরোশিমা নাগাসাকি এবং রাসায়নিক অস্ত্রে ভিয়েতনাম ও ইরাকের মাটি করেছে দগদগে। তাদের জন্যই সমুদ্র - নদী দূষিত, দূষিত বাতাস, বাড়ছে তাপ, হচ্ছে ওজোন স্তরের ক্ষতি। বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া, আসছে ক্যাটারিনা, রীটা, টাউফু, জীটা, এল নিনো। মরুভূমি বাড়ছে, বন ধ্বংস হচ্ছে, বাড়ছে ভূমিক্ষয়। কোটি কোটি টন উর্বর মাটি চলে যাচ্ছে সাগরে, নদীতে। হারিয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির প্রাণী আর উদ্ভিদ।

মনে রাখতে হবে পরিবেশ সমস্যা বিশ্বজনীন। তা একটা অঞ্চলে, দেশে বা মহাদেশে আটকে থাকে না। তাই পণ্য সভ্যতার এই পরিবেশঘাতী স্বরূপের চাপ আছড়ে পড়ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর। জনসংখ্যার তীব্র চাপের সঙ্গে পরিবেশের এই দুরবস্থা এই দেশগুলোর পরিবেশকে বাঁচার অন্তরায় করে তুলেছে। তাই তো ১৯৯২ সালে রিও-ডিজেনিরো-তে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে (আর্থ সামিট) কিউবার রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, ''অবসান হোক স্বার্থমগ্নতার, আধিপত্যবাদের, সংবেদনশীলতা হীনতার, দায়িত্বহীনতার আর প্রবঞ্চনার, যারা জন্ম দিয়েছে এই শিল্পসভ্যতা আর পণ্যসভ্যতা।''

গ্রিন হাউস গ্যাস আর বিশ্ব পরিবেশ রাজনীতি

শিল্পসভ্যতা আর পণ্যসভ্যতার অন্যতম বর্জ্য হিসেবে বাতাসে আসছে নানারকম গ্যাস— যাদের একদল বাতাসের তাপমাত্রা বাড়াতে পারে। এদেরকে বলে গ্রিন হাউস গ্যাস। শীতের দেশে কাঁচের ঘরের ভেতর উষ্ণ আবহাওয়ার গাছপালার চাষ করা যায়। কারণ কাঁচ সূর্যের আলোকে ভেতরে যেতে দেয় কিন্তু তাপকে আর বাইরে আসতে দেয় না। ফলে কাঁচের ঘরের ভেতরে গরম আবহাওয়া তৈরি হয়। গরমের দেশের গাছপালা হতে তাই আর বাধা থাকে না। একেই বলে গ্রিন হাউস এফেক্ট। কাঁচ যেমন তাপকে ধরে রাখতে পারে তেমনি কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথন, ওজোন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরো ফ্লুরোকার্বন বা সি. এফ. সি., জলীয় বাষ্প শুষে এরা আবহাওয়ার তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এদেরকে বলে গ্রিন হাউস গ্যাস। পণ্য সভ্যতার ফলে এই গ্রিন হাউস গ্যাস বাতাসে কিভাবে বেড়েছে সামান্য দু'একটা উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট হবে। ১৮৫০ সালে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২৬৫ পিপিএম (দশ লক্ষ বাগে ২৬৫ ভাগ)। অথচ ১৯৯৫ সালে তা দাঁড়ায় ৩৫৯ পিপিএম। শিল্পবিপ্লবের পর ১৭০০০ কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছাড়ার ফলেই এমনটা হয়েছে। এছাড়া গত তিনশো বছরে বাতাসে মিথেনের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। ছিল ৬৫০ পিপিবি এখন হয়েছে প্রায় ১৭০০ পিপিবি। ইন্টার গভর্ণমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (আই পি সি সি) বিজ্ঞানীদের মতে, এভাবে চললে ২০৩০ সালের মধ্যে ১° এবং একবিংশ শতকের শেষে ৩° সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে আবহাওয়ার। ফলে মাটির আর্দ্রতা নষ্ট হবে। রুক্ষ হয়ে উঠবে মাটি। ফসল হবে অনিশ্চিত। হিমবাহরা পিছিয়ে যাবে। বাড়বে মরু অঞ্চল। বরফ গলে গেলে ভেসে যাবে সমুদ্রতীরের জনপদ। এক তীব্র ও অনিশ্চিত আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। অথচ এই তাপবৃদ্ধির জন্য আমরা কতটুকুই বা দায়ী? ভারত, চিন ও ব্রাজিল মিলে পৃথিবীর ৫০ শতাংশ জনসংখ্যা ধারণ করে। অথচ এই তাপ বৃদ্ধিতে তাদের ভূমিকা মাত্র ১৫ শতাংশ। আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মাত্র ৭ শতাংশ মানুষের বাস। অথচ গ্রিন হাউস গ্যাস তারা ছাড়ে ২৫৫ শতাংশ। তাইতো দক্ষিণের দেশগুলো থেকে দাবি উঠেছে গ্রিন হাউস গ্যাসে আবহমন্ডল বাড়িয়েছে যারা সেই উত্তরের দেশগুলোকে এই ভূ-তাপবৃদ্ধির দায় নিতে হবে। রিও সম্মেলন তা স্বীকারও করে।

কিয়োটোর আগে আর কিয়োটোর পরে

১৯৯২তে রিও সম্মেলনে গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার মূল কথা ছিল অতিরিক্ত গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি করে যেসব দেশ তাদের ঐ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ২০০০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের স্থরে নামিয়ে আনতে হবে। এজন্য সমগ্র দেশগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একভাগে ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংগঠনের (OECD) সদস্য উন্নত ২৪ টি দেশ। তাদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সমগ্র বিষয়টিতে নেতৃত্ব দেওয়ার। কিন্তু কোনো আইনের বেড়ায় না বেঁধে সবটাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের সদিচ্ছার উপর। অন্যভাগে ছিল OECD, ইউরোপিয়ান কমিশন (EC) এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বাজার অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হওয়া দেশগুলো এবং আগের সোভিয়েত রাশিয়া। এদের দায়িত্ব ছিল শুধু গ্রিন হাউস গ্যাস কমানোর নয়, একই সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইডের শোষণ ও আধার বাড়ানো। বনাঞ্চল তৈরি করে এবং জলাভূমি বাড়িয়ে দ্বিতীয় কাজটি সম্ভব। কার্বন ডাইঅক্সাইডের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভূমিকা ৪৯ ভাগ, মিথেন দায়ী শতকরা ১৮ ভাগ, সি.এফ.সি. ১৪ ভাগ, নাইট্রোজেন অক্সাইড .৬ ভাগ, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস দায়ী শতকরা ১৩ ভাগ। তাই মূল জোর পড়েছিল কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিয়ন্ত্রণের ওপর। তৃতীয় ভাগে রাখা হয়েছিল উন্নয়নশীল মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে। তাদের উন্নত দেশগুলোর আর্থিক ও প্রাযুক্তিক সহযোগিতা নিয়ে একাজ করার কথা ছিল। উন্নত দেশগুলো এই সহযোগিতা করলেই কেবল তারা দায়িত্ব পালন করবে এটাও স্পষ্ট করা ছিল। ১৯৯২-র পর ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশান অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ (FCCC) -র এই তিন ভাগের দেশগুলোর প্রথম সভা হয় ১৯৯৫ -তে বার্লিনে (CoP-1) সেখানে হয় পর্যালোচনা। এদের তৃতীয় সভা হয় ১৯৯৭ -এর ১লা থেকে

১০ই ডিসেম্বর কিয়োটো শহরে। সেখানেই তৈরি করা হয় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন। এসবই কিয়োটো প্রোটোকল নামে খ্যাত।

কি আছে কিয়োটো প্রোটোকলে? যাব আমরা সে কথায়। তবে তার আগে একটু শুনে নিই কেন জমে উঠেছিল সেই সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য ১৯৯৭ -এর জুলাই মাসে বন শহরের সভাটি। ১৪২টি দেশের ৭০০ জন প্রতিনিধি ও ৫৭০ জন দর্শকের উপস্থিতিতে ঐ সভায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন ২০০০ সালের পরিবর্তে ১৯৯০র স্তরে গ্রিন হাউস গ্যাস নামিয়ে আনার জন্য নতুন লক্ষ্য হিসেবে ২০১২ সালকে স্থির করার প্রস্তাব দেন। উন্নয়নশীল দেশগুলো এমনকি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলে ২১০২ সালের মধ্যে ১৯৯০-র নির্গমন মাত্রার ১৫ শতাংশ কমানো হোক। জাপানের প্রস্তাব ছিল ৫ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়া এ ব্যাপারে আবার আইনগত বিধিনিষেধেরই বিরোধিতা করে। এবার আসি কিয়োটো প্রোটোকলের কথায়।

কিয়োটো প্রোটোকল অনুযায়ী স্থির হয় নতুন তিনটে গ্যাসকেও গ্রিন হাউস গ্যাসের আওতায় আনা হবে। এগুলি হল হাইড্রো ফ্ল্যারোকার্বন, পারফ্লুরোকার্বন এবং সালফার - হেক্সাফ্লুরাইড।

স্থির হয় উত্তরের দেশগুলো ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তাদের ১৯৯০ এর নির্গমন মাত্রার ৫.২ শতাংশ কমাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৭ শতাংশ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৮ শতাংশ এবং জাপান ৬ শতাংশ কমানোর জন্য স্বীকৃত হয়। ঠিক হয় নতুন তিনটে গ্যাসের নির্গমন মাত্রা এই সময়কালে ১৯৯৫ -এর স্তরে নামিয়ে আনা হবে।

কিয়োটো প্রোটোকলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুধুমাত্র এমন পদ্ধতি নিতে অনুরোধ করা হয় যা তাদের ভবিষ্যৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন কমাবে। এজন্য উত্তরের শিল্পোন্নত দেশগুলোর আর্থিক সাহায্য নেওয়া যাবে, কিন্তু মজার বিষয়, এভাবে যত কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন কমবে তা ঐ উত্তরের দেশ কমিয়েছে ধরা হবে এবং তাদের সামগ্রিক গ্রিন হাউস হ্রাসের হিসেবে তা যুক্ত হবে। অর্থাৎ গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন নিজের দেশে কিছুমাত্র না কমিয়ে অল্প ব্যয়ে দক্ষিণের দেশে এসে তারা সে কাজ করে যাবে।

তবে কিয়োটো প্রোটোকলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের শিল্পোন্নতির স্বার্থে কার্বন ঘেঁষা পথ নিতে বারণ করা হয়নি। তাদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আসবে তারা শিল্পোন্নত হবার পরেই। এত বড় বিরোধী ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারা এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলো অনেক নাচন কোঁদন করেছে কেমনভাবে আগামী দিনে উন্নয়নশীল দেশগুলোই সর্বোচ্চ গ্রিন হাউস ছড়াবে, তা নিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বিকল্প কোন ভালো ভাবনা কিয়োটোতে দিতে পারেনি। শতকরা ২০ ভাগ জনসংখ্যা নিয়ে এই শিল্পোন্নত দেশগুলো ৮০ ভাগ গ্রিন হাউস গ্যাস ছাড়ে যেখানে ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর প্রায় ১৬ ভাগ হলেও তারা গ্রিন হাউস গ্যাস ছাড়ে মাত্র ০.৯ ভাগ। ভারতের মাথাপিছু গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন ০.২৫ টন, আর আন্তর্জাতিক মাত্রা ০.৬ টন। তাই ভারত আরও আড়াই গুণ গ্রিন হাউস গ্যাস ছাড়ার সুযোগ নিতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তরের দেশগুলোর এসব যুক্তি না - পছন্দের।

কিয়োটোতে মূলত মার্কিন চাপে স্থির হয় আন্তর্জাতিক পথে বিমান চলাচল এবং জাহাজ চলাচলের জন্য এবং রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে সামরিক অভিযানের ফলে নির্গত গ্রিন হাউস গ্যাসকে কিয়োটো প্রোটোকলের বাইরে রাখা হবে। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘের বকলমে আমেরিকা বিভিন্ন হানাদারি, পেশি আস্ফালন এবং আগ্রাসন অব্যাহত থাকার সুযোগ পেয়ে গেল। ন্যাটোর মত উন্নত দেশগুলোর সামরিক সংগঠন বিশ্ব জুড়ে তাদের ঘাঁটিগুলোকে সমন্বিত ও সুসংহত রাখার সুযোগ পেয়ে গেল।

উত্তরের উন্নত দেশগুলোর স্বার্থে কিয়োটোতে তিনটে পথ বাৎলে দেওয়া হয়— যাতে তারা ভোগবাদ অক্ষুণ্ণ রেখেই গ্রিন হাউস গ্যাস কমাতে পারে এগুলি হল Joint Implementationবা যৌথ প্রয়োগ, Clean Development Mechanismবা পরিচ্ছন্ন উনয়ন প্রক্রিয়া এবং Emissions Trading বা নির্গত গ্যাসের ব্যবসা। যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ৬, ১২ এবং ১৭ -তে এগুলো রাখা হয়। আজ ব্যাপকভাবে প্রশ্ন উঠেছে এই অনুচ্ছেদগুলোকে ঘিরেই। স্বভাবতই এগুলো নিয়ে আলোচনা দরকার। কিন্তু তার আগে আরও কয়েকটা তথ্য জানানো দরকার।

কিয়োটো প্রোটোকলে স্বাক্ষর করার জন্য তা ১৯৯৮ এর ১৬ই মার্চ থেকে উন্মুক্ত করা হয়। ৩৯টি দেশ মে মাসের মধ্যে সই করলেও আমেরিকা করেনি। চিন, জাপান, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলি সই করলেও আমেরিকা করেনি। কিয়োটোর আগে তারা সেনেটে ৯৫-০ ভোটে ঠিক করেছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও গ্রিন হাউস গ্যাস কমানোর বিধিনিষেধের মধ্যে আনতে হবে। অন্যথায় তারাও কোন আইনগত বাধানিষেধের চুক্তিতে যাবে না। এখন তারা বলতে চায় সমগ্র মার্কিন সামরিক কর্মসূচিকে কিয়োটোর বিধিনিষেধের বাইরে রাখতে হবে। এ এক অন্যায় আবদার। এমনকি সেনেটের কাছে কিয়োটো প্রোটোকলের বিরোধিতা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশ এক চিঠিতে লিখলেন— ''...if exempts 80 percent of the world, inclucin major po;ulation countries such a China and India for compliance and would cause serous harm to US Economy.''

শুধু নিজেদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেই বিশ্ব পরিবেশ ধ্বংসের জায়গা থেকে তিনি সরতে রাজি নন। তাইতো এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলতে পারেন— ''...I did not believe that the Government should impose on power plants mandatory emission reductions for carbon dioxide which is not a pollutant...This is especially true given the incomplete state of scientific knowledge of the causes of and solutions to global climate change.''

একথা বলা আমেরিকারই সাজে! যখন বিজ্ঞান তার বিরুদ্ধে কথা বলে তখন বিজানটাকেই ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া ঔদ্ধত্য তারাই দেখাতে পারে!

কিয়োটো প্রোটোকলে ৫৫টি দেশ স্বাক্ষর করলে আর তাদের মোট গ্রিন হাউস গ্যাস ছাড়ার পরিমাণ ৫৫ শতাংশ হলে তবেই এই চুক্তি কার্যকরী হবে স্থির রয়েছে।

কিয়োটোর প্রেসক্রিপশন এবং ধনী দেশগুলোর স্বার্থ

উত্তরের ধনী দেশগুলোর স্বার্থে কিয়োটোতে দেওয়া তিনটে প্রেসক্রিপশন এবার একটু খতিয়ে দেখা যাক। প্রথমটি ছিল যৌথ প্রয়োগ সংক্রান্ত। এর মূল কথা হল কম খরচে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কমিয়ে আনা সম্ভব উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে যৌথ প্রকল্পে গিয়ে। নরওয়ের এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিল জার্মানি। ফ্রান আবার জার্মানির এই ধারণার বিরোধী। তারা মনে করে না যে উন্নত দেশে গ্রিন হাউস গ্যাস কমানো প্রচন্ড ব্যয়বহুল। সে যাই হোক, যৌথ প্রয়োগের নীতিতে উত্তরের উন্নত দেশ যদি কোনো দক্ষিণের দেশকে প্রযুক্তিগত কোনো সাহায্য করে, বা বনাঞ্চল তৈরিতে বাজলাভূমি রক্ষায় সাহায্য করে তবে তার ফলে যতটা গ্রিন হাউস গ্যাস হ্রাস হবে, উন্নত দেশটিকে তার নিজের দেশে ততটা গ্রিন হাউস গ্যাস কমাতে হবে না। এইভাবে শিল্পে উন্নত দেশগুলো নিজের শিল্প বিকাশ ও জীবাশ্ম জ্বালানী - নির্ভর শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা বিন্দুমাত্র না কমিয়েই তার গ্রিন হাউস নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। আমেরিকা তার কানেকটিকাটের বিদ্যুৎরেন্দ্র থেকে উৎপাদন গ্যাস শোষণের জন্য বিশাল বনভূমি তৈরিতে সাহায্য করেছে কোস্টারিকায়। অর্থাৎ উন্নত দেশগুলোর বিষ শুষে নীলকণ্ঠ হবে উন্নয়নশীল দেশগুলো। আবার 'কম গ্রিন হাউস গ্যাস দেয়' এমন প্রযুক্তির নাম করে উন্নত দেশগুলো

তাদের পরিত্যক্ত বা পরীক্ষণীয় প্রযুক্তির সহজে চালান করার জায়গা হিসেবে বেছে নিতে পারে তৃতীয় বিশ্বকে, এমন আশঙ্কাও কম নয়।

দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশন ছিল পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বা Clean Development Mechanism বিষয়ে। এই প্রস্তাব ছিল মূলত ব্রাজিলের। এই প্রস্তাব অনুযায়ী উত্তরের উন্নত দেশগুলো ধাপে ধাপে গ্রিন হাউস গ্যাস কমাতে হবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১৯৯০ -র চেয়ে ৩০ শতাংশ গ্যাস কমাতে হবে। এজন্য পাঁচ বছরের ছোট ছোট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে এগোনোর কথা বলা হয়। প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশের জন্য সিলিং বেঁধে দেওয়া হয়। এর অতিরিক্ত গ্যাস ছাড়ার জন্য ইউনিট প্রতি ৩.৩৩ মার্কিন ডলার দিতে হবে, যা যাবে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে। কিন্তু এই প্রেসক্রিপশনেও উন্নত দেশগুলিরই সুযোগ। কেমন করে? এই প্রকল্পে ১৯৯০ -র বহু আগে থেকে যারা বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও গ্রিন হাউস গ্যাস ছেড়ে এসেছে তাদের জন্য কোন শাস্তি বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। উদাহরণ দিয়ে বলি ঃ ১৯৯০ -তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু গ্যাস ছাড়ার পরিমাণ ছিল ৫.৪১ টন, ২০০৫ সালে ২০ শতাংশ কমালে সেটা দাঁড়াবে ৪.৩৩ টনে। এটাও ভারতের কুড়ি গুণ। ব্রিটেন ১৯৯০ -তে মাথাপিছু ছাড়তো ২.৭৮ টন। ২০ শতাংশ কমলে সেটা দাঁড়াবে ২.১৯ টনে। মার্কিন বিজ্ঞানী কির্ক আর স্মিতের মতে ভারত বর্তমান হারেই যদি শিল্পোন্নয়ন চালিয়ে যায় তবে ২০২৪ সালে তার মাথাপিছু গ্যাস ছাড়ার পরিমাণ দাঁড়াবে ১ টন—যা ১৯০০ সালে অর্থাৎ ১২৫ বছর আগে আমেরিকার ছিল। এই বড় বিষয়টিকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ৩০ শতাংশ হ্রাস হলেও তাদের গ্রিন হাউস গ্যাস ছাড়ার পরিমাণ থাকবে বিশাল, তারা এগিয়ে ছিল আর তারই সুযোগ পেল। আর এতদিন ধরে পৃথিবীর বাতাস আর পরিবেশ নষ্ট করে যাওয়ার কোন দায়দায়িত্ব তাদের নিতে হল না।

বরং পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া (সি.ডি.এম.) স্টক এক্সচেঞ্জের ন্যায় 'কার্বন ব্যাঙ্ক' তৈরির ধারণা আনা হল। উত্তরের দেশের সরকার ও কোম্পানিগুলো উন্নয়নশীল দক্ষিণের দেশে গ্রিন হাউস গ্যাস কমানোর লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা নেবে। আর তার ফলে ঐ গ্যাস যতটা হ্রাস করা সম্ভব হবে তা তাদের দেশের 'কার্বন জমা' হিসেবে ধরা হবে। তেমনি অন্য দেশের জমা কার্বন কিনে নিয়ে কোন উন্নত দেশ তার গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ হয়েছে দেখাতে পারবে। অর্থাৎ এখানেও উন্নত দেশগুলোর স্বার্থে পুরোদস্তুর কার্বন ব্যবসার ঢালাও ছাড়পত্র।

তৃতীয় প্রেসক্রিপশন ছিল গ্যাসের ব্যবসা। এটাও বুঝতে হলে উদাহরণেই সুবিধে। সোভিয়েত দেশ গেছে ভেঙে। ওদের সবার এখন গ্রিন হাউস গ্যাস ছাড়ার পরিমাণ ১৯৯০ -এরও ৩০ শতাংশ কম। এখন ধরা যাক, রাশিয়া আর আমেরিকা চুক্তি করল। চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া তার গ্রিন হাউস গ্যাস যতটা বাড়াতে পারতো তা বাড়াবে না বরং ঐ বৃদ্ধিটুকু করার সুযোগ সে দেবে আমেরিকাকে। ফলে রাশিয়া হয়তো একটা বড় অঙ্কের টাকা পাবে। তাহলে ঐ টাকা এলো গ্রিন হাউস গ্যাস ছাড়ার ক্ষমতা বিক্রি করে। এই ব্যবসায় বহু উন্নয়নশীল দেশকে ব্যবহার করবে উন্নত দেশগুলো। তাদের টাকা আছে। তাই দিয়ে তারা উন্নয়নশীল দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নকেও কিনে নেবে। কেন একথা বলছি? উন্নয়নশীল দেশগুলোর কার্বন জমা এভাবেই ফুরিয়ে গেলে তখন কিন্তু উন্নত দেশগুলো এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে উন্নয়নের প্রশ্নে কোনো ছাড় দেবে না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্বনির্ভরতার প্রশ্নটি একেবারে তলিয়ে যাবে। অথচ তখন বিশ্বের পরিবেশ হয়ে উঠেছে আরো কলুষময়।

ওজোনস্তরের ক্ষয় আর ভোগবাদের জয়

আমাদের বায়ুমন্ডলে রয়েছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। পৃথিবীপিঠ থেকে বেশ কিছুটা উপরে এই স্তর, প্রায় ১০ কিলোমিটার উপর থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এই স্ট্যাটোস্ফিয়ারে তাকে ওজোন গ্যাস। ওজোন ৪০০০ ন্যানোমিটারের কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো, যাকে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বলে তা শুষে নিতে পারে। এই রশ্মির জীবকোষকে নষ্ট করে দেওয়ার বা পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তাই ওজোন ছাতা এককথায় জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রাখে।

১৯৮২ সালে বৃটিশ আন্টার্কটিকা সার্ভের বিজ্ঞানী ডঃ জো ফারম্যান প্রথম বলেন আন্টার্কটিকায় ওজোনস্তরের ক্ষয়ের কথা। ১৯৮৫ সালে নেচার পত্রিকায় তাদের নিবন্ধে দেখা যায় আন্টার্কটিকার ওজোনের মাত্রা ২০০ ডবসন ইউনিটে (D.U.) দাঁড়িয়েছে যেখানে স্বাভাবিক মাত্রা হল ৩০০ ডবসন ইউনিট। নানাও পরীক্ষা - নিরীক্ষা করে দেখে শুধু আন্টার্কটিকা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ওজোন স্তরের ক্ষঠ ঘটছে ২-৩ শতাংশ। ১৯৯৩ সালে সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এসব তথ্য। ১৯৭৮ সালে নিম্বা-৭ উপগ্রহ প্রথম Total Ozone measuring spectormeter যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে কেন দক্ষিণ মেরুতে ওজোনের পরিমাণ সামান্য দেখিয়েছিল তা বোঝা যায় এবার। ধরা পড়ে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বা সি.এফ.সি. থেকে সক্রিয় ক্লোরিন পরমাণু তৈরি হয় যা ওজোনকে ভেঙে ফেলতে পারে। দক্ষিণ মেরুর পরিবেশ একাজে আরও সাহায্য করে। এই সি. এফ.সি. আমাদের ভোগবাদী সব্যতার ফসল। ওজোন স্তরের ১০ শতাংশ কম হলে সারা পৃথিবীতে চামড়ার ক্যান্সার বেড়ে যাবে ২৫ শতাংশ। ফাইটো প্লাঙ্কটন সৃষ্টি কমে যাবে। দক্ষিণ সমুদ্রে ফাইটো প্লাঙ্কটন কমলে কমবে ক্রিলেরা। ফলে সিল এবং তিমিদের খাদ্যসংকট দেখা দেবে। অন্যরকম এক পরিবেশ সমস্যার মুখোমুখি হবো আমরা। তাছাড়া এই সি.এফ.সি. গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের থেকে ১০০০০ গুণ বেশি সক্রিয়।

বাড়ি ঠান্ডা করার যন্ত্র বা এয়ারকন্ডিশনার, ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর, ডিওডোরান্ট এবং সুগন্ধ স্প্রে, প্লাস্টিক, পোন এবং প্যাকেজিং শিল্পে সি.এফ.সি. ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৮৬ সালের রিপোর্ট থেকে আমরা দেখি এই সি.এফ.সি. ব্যবহারে উন্নত দেশগুলোই লাগামছাড়া ভাবে এগিয়ে। তারা ব্যবহার করে ৮৭.৬ ভাগ, অন্যদিকে উন্নয়নশীল অতগুলো দেশ মিলে মাত্র ১২.৪ ভাগ। ওদের ঘর ঠান্ডা চাই, গাড়ি ঠান্ডা চাই, বাড়িতে জনপ্রতি ১টা গাড়ি চাই, প্রসাধনী স্প্রে চাই। তাই সি.এফ.সি. চাই। আর আমাদের তো দু'বেলা খাবারটা আগে চাই। তবু ওরা আকাশ ফুটো করে বিষ রশ্মি ঢুকিয়ে দেবে, আর তার দায় নিতে হবে সকলকে। সারা পৃথিবী ১৯৮৬ সালে মোট ৭৭২ টন সি.এফ.সি. ব্যবহার করেছিল। ভাগটা ছিল এরকম ঃ একা আমেরিকা ১৯৭ টন, ইউরোপের দেশগুলো ২৪৮ টন, জাপান ৫৮ টন, কানাডা ২১ টান, চিন ১৮ টন এবং ভারত মাত্র ০.৪ টন।

এই অবস্থায় রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ওজোন ধ্বংস করতে পারে এমন রাসায়নিকগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়ে ১৯৭৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে একটি চুক্তি তৈরি হয়। যুক্তিটি মন্ট্রিল প্রোটোকল নামে খ্যাত। আসল নাম— Montreol Protocol on substances that deplet the ozone layer . ২৪ টি দেশ এতে সই করে। এর আগে একই উদ্দেশ্যে ভিয়েনার ১৯৮৫ সালে যে সভা হয় সেখানে আবেগের বন্যা বইয়ে উত্তরের রাষ্ট্রগুলো সকল দেশকে ওজোন স্তর রক্ষার সমান দায়ভার নিয়ে পৃথিবীকে বাঁচাতে উদাও আহ্বান জানায়। ভাবখানা এমন, আহা! কে কতটা দায়ী বিচার করে কি হবে, আগে তো গ্রহটা বাঁচুক! মুখে বলেও ফেললেন তা মার্গারেট থ্যাচার। ধনী গরিব সবার সমান দায়। এটা আন্তজতাতিক সমস্যা। কিন্তু তখন প্রতিবাদ করেছিল ভারত আর চিন। বৈষম্যভরা বিধান কি বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া যায়? ভোগবাদী জীবন আর পণ্য সভ্যতার কুফল বিনা বাক্যব্যয়ে সবাই মেনে না নিলে আসে পেশিশক্তির হুমকি।

মন্ট্রিল প্রোটোকলে বলা হল যে ওজোন ধ্বংস করে যেসব রাসায়নিক তাদের ব্যবহার ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিতে হবে। এর উৎপাদন বন্ধ করতে হবে এবং কেনা বেচাও ধাপে ধাপে বন্ধ করে দিতে হবে। আরও ঠিক করা হল উন্নত দেশগুলো আগে এর ব্যবহার

ও উৎপাদন বন্ধ করবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আর দশ বছর বেশি সময় দেওয়া হবে।

শুনতে কি ভালো লাগে। আমরা আগে বন্ধ করছি তোমরা ধীরে ধীরে করো। যে আমরা আগে প্রাণ দিচ্ছি এমন ভাব। তোমরাই তো সি.এফ.সি. তৈরি কর, তোমরাই ব্যবহার কর বেশি বেশি। আর বিকল্প রাসায়নিক তৈরির গবেষণাও তোমরা চালিয়ে যাচ্ছ। তাই তোমাদের তো কোন ক্ষতিই নেই। দ্বিতীয়ত ভাল বিকল্প রাসায়নিকটা সবার জন্য নয় কেন? কেন আরো দশ বছর ধরে উন্নয়নশীল দেশে সি.এফ.সি. ব্যবহৃত হবে? তার কারণ, কেউ কেউ সন্দেহ করেন, বড় গভীর। ১৯৮৭ -র এই সম্মেলনে যখন উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধের সময়সীমা তৈরি হয় তখন সি.এফ.সি. বানানো মাত্র দুটো সংস্থা— আমেরিকার ডু পন্ট এবং ব্রিটেনের আই.সি.আই., এদের বাণিজ্যের সুবিধে করে দেওয়ার জন্য উন্নত দেশগুলোকে ১৯৯৫ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ২০০৫ সাল অবধি সি.এফ.সি. ব্যবহারে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। অন্যথায় তাদের ভাঁড়ারে জমে থাকা লক্ষ লক্ষ টন সি.এফ.সি. হবেটা কি? তাই উন্নত দেশগুলোর কাছে বিশ্বের পরিবেশ নয় ব্যবসাটাই অগ্রাধিকারের। নিচে ওজোন নষ্ট করে এমন রাসায়নিকের মন্ট্রিল প্রোটোকল অনুযায়ী উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধের সময়সীমা উল্লেখ করা হল আগ্রহীদের জন্য।

রাসায়নিক	ব্যবহার ও উৎপাদন বন্ধের সময়সীমা	
	উন্নত দেশ	উন্নতিশীল দেশ
ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন	১৯৯৫	২০০৫
হ্যালোন	১৯৯৩	২০০৩
কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড	১৯৯৫	২০০৫
মিথাইল ক্লোরোফর্ম	১৯৯৫	২০০৫
হাইড্রো ক্লোরোফ্লুরোকার্বন	২০২০	২০৩০
হাইড্রো ব্রোমোফ্লুরোকার্বন	১৯৯৫	২০০৫
মিথাইল ব্রোমাইড	২০০৫	২০১০

পুরনো প্রযুক্তি চালু রাখলো ব্যবসার স্বার্থে। নতুন প্রযুক্তি (হাইড্রো ফ্লুরো কার্বন—এতে ক্লোরিনই নেই) যা এল তাও তারা দিল না ব্যবসার স্বার্থে। তাইতো বলা হয় সম্পদ ও প্রযুক্তি গোটা গ্রহ জুড়ে বিলি করা না হলে পরিবেশের সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

মেধা সম্পদ আর জিন প্রযুক্তির নতুন ক্ষেত্র ও জীবসম্পদ হরণ

গ্যাট থেকে ডব্লিউ.টিও. -তে বদলানো নতুন বিশ্বব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে এসেছে মেধা সম্পদের অধিকারের প্রশ্ন। আর এই মেধা সম্পদের অধিকারের নামে উন্নতিশীল দেশগুলোর জীবসম্পদ হরণ এবং কৃষিক্ষেত্রকে দখলের এক অপপ্রয়াসে নেমেছে উন্নত দেশগুলি। ছোট ছোট উদাহরণ এক এক করে দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা ভালো।

সমস্ত উন্নতিশীল দেশগুলো জীব সম্পদের জার্ম - প্লাজম আন্তর্জাতিক জিন ব্যাঙ্কে রয়েছে। এর খাতায় কলমে নাম Consultative Group of International Agricultural Research বা CGIAR. এর অর্থনৈতিক মূল্য প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার CGIAR রাষ্ট্রসংঘের Food and Agriculture Organisation বা FAO -এর অধীন। FAO তা সর্বসাধারণকে ব্যবহারের জন্য দিতে পারে। ফলে আমাদের সমস্ত জিন আজ উন্নত দেশগুলোর হাতে। তাদের তা নিয়ে গবেষণার অধিকার আছে। অথচ আমাদের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সে পথে অন্তরায়। তারা সেইসব প্রজাতির গাছ থেকে, শস্য থেকে বা ফল থেকে নতুন নতুন পদার্থ বের করে তার মেধাসম্পদের দাবিদার হয়ে উঠছে। কখনো গাছটির সামান্য জিনগত পরিবর্তন করে তাকে নতুন নাম দিয়ে তা পেটেন্ট করে নিচ্ছে। বাসমতি, নিম, করলা, মেথি এসব আমাদের সম্পদ লুঠ হয়ে যাচ্ছে এই পথে।

শস্যের ক্ষেত্রে অবস্থা কত করুণ তার আলোচনা ছোট করে সেরে নেওয়া যায়। শুধুমাত্র ধানের অসংখ্য রকম প্রজাতি ছিল আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। কিন্তু এখন উচ্চ ফলনশীল জাতের সামান্য কয়েকটি প্রজাতিরই মাত্র চাষ হয়। সেগুলো আবার জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি। তারা জল বেশি নেয়, বেশি সার নেয় আর অনেক কীটনাশক লাগে তাদের চাষে। পরিবেশে বড় আঘাত পড়ে। তবু তাদেরই চাষ করতে হয় আমাদের ভাল ফসলের জন্য। অথচ আমাদের নিজস্ব প্রজাতিগুলো— যাদের অনেকে ছিল সুগন্ধি, অনেকে ভাল লম্বা ভাত দিত, অনেকে মুড়ি বা চিঁড়ে বানানোর জন্য ছিল উপযুক্ত, অনেকের চাষ হতে পারতো কম জলে, অনেকে আবার ছিল গভীর জমির বেশি জলের চাপ সহ্য করা প্রজাতি। আমাদের সেইসব পুরোনো নিজস্ব প্রজাতিগুলো আমাদের কাছে শুধুতো প্রজাতিটাই হারায়নি, হারিয়ে গেছে গোটা জানটাই। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতির সুবাদে ওরা ঐ প্রজাতিগুলোর পরিবেশ সুবেদী গুণগুলো ছিনিয়ে, খরায়, বন্যায় চাষ হওয়ার নতুন ধান নতুন নামে এনে, আমাদের জিনিসকেই আবার বেচবে আমাদেরই কাছে। এই চাতুরির কোনো ক্ষমা নেই। নিচে শুধুমাত্র ধানের ক্ষেত্রে অবস্তাটা দেখানো হল ঃ

ওলাকা	পূর্বে যত ধানের ধান চাষ হত	বর্তমানে চাষ হয়
সমগ্র এশিয়া	১০০০০০ (এক লক্ষ প্রায়)	৭০ শতাংশ জমিতে ১২ রকম
ভারতবর্ষ	৩০০০০ (তিরিশ হাজার)	৭৫ শতাংশ জমিতে ১০ রকম
শ্রীলঙ্কা	২০০০ (দু হাজার)	৭৫ শতাংশ জমিতে ৫ রকম
ফিলিপাইন	৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশো)	৭৫ শতাংশ জমিতে ৮ রকম

তৃতীয় বিশ্বকে চাষে সাহায্যের নামে পরিবেশ নষ্ট করা তাদের আর এক অপরাধ। প্রসঙ্গ বি.টি.কটন নামে জিন পরিবর্তিত তুলা চাষের কথা উল্লেখ করা যায়। বোলওয়ার্ম পোকা লাগবে না এবং ফলন বেশি হবে শুনে বেশি দাম দিয়ে বীজ কিনে এই তুলার চাষ করলো অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাটের কৃষকরা। পরে দেখা গেল এর প্রভাবে মৌমাছি, বোলতা ও মাকড়সারা মারা যাচ্ছে। আর বোলওয়ার্ম না হলেও অন্য রোগপোকায় এই গাছ আক্রান্ত হচ্ছে বেশি বেশি, ফলে কীটনাশকও লাগছে ভালোই। তৃতীয়ত ফলন মোটেই বেশি নয়। তাই বেশি দামের বীজ কিনে, আবার কীটনাশক দিয়ে, সার জল দিয়ে, আশানুরূপ ফলন না পেয়ে অসংখ্য কৃষক আত্মহত্যা করলেন। তেমনি মনসান্টো কোম্পানি রাজস্থানে 'রাউন্ড আপ' নামের ভুট্টাচাষের ক্ষেত্রে আগাছা দমনের জন্য বিশেষ আগাছানাশক নিয়ে এল। এরা সবাই কিন্তু বড় বড় মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি। যাইহোক, ঐ আগাছানাশক দিয়ে দেখা গেল আগাছা তো মরছেই, সেইসঙ্গে মরছে জমির আলে, বাঁধে ধারে থাকা অসংখ্য বিরল প্রজাতির ঔষধি গাছও। কেউ কেউ হয়তো এমনিভাবে চিরতরে হারিয়ে যাবে! তাছাড়া মূল ভুট্টার মাঠকে মাঠ যাচ্ছে শুকিয়ে। কেন? আগাছানাশকের প্রতিক্রিয়ায় নাকি? না। আগাছা মারার যাওয়ায় ফিউসারিয়াম

নামে এক ছত্রাকের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। তাদেরই আক্রমণে গাছগুলো যাচ্ছে শুকিয়ে। এই বহুজাতির কোম্পানিগুলো উচ্চফলনশীল শস্য বা সবজির বীজ বিক্রি করছে টারমিনেটার জিন ভরে। অর্থাৎ ঐ বীজ থেকে একবারের বেশি ফসল হবে না। কৃষক বীজের অধিকার হারাবে। বারবার তাকে বীজ কিনতে হবে বহুজাতিকের কাছ থেকেই। যার দাম বলবে সেই দামেই। এমনিভাবে তৃতীয় বিশ্বের কৃষিক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করছে ওরা।

নতুন আর এক বিপদ এসেছে জি.এম. শস্য বা জি. এম. ফুড। জি.এম. অর্থাৎ জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বা জিন পরিবর্তিত। জি.এম. আলু, বি.টি. বাসমতি, গোল্ডেন রাইস প্রভৃতি নানা শস্য তৈরি করলেও নিজেরা না খেয়ে তা চালান করছে তৃতীয় দুনিয়ায়। শ্রীলঙ্কা তা নিতে অস্বীকার করলে তাকে ১৯০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়া হবে জানিয়েছে আমেরিকা। ক্রোয়েশিয়ার পরিবেশমন্ত্রী বোজো কোভাশেভিক অবশ্য মার্কিন হুমকিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তাদের খাদ্য পরীক্ষা আইনের প্রয়োগ করবেন বলেছেন। আমাদের দেশে যো গোল্ডেন রাইসের কথা বলা হচ্ছে তা আসলে বাসমতিতে আয়রণ আর ভিটামিন-এ'র জিন ভরে। বি.টি.বাসমতি হবে রোগপ্রতিরোধের জিন ভরে। কিন্তু R.S Sheshadri সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন— 'Anything connected to G.M. is the kiss of death of Basmati.'

আসুন আমরা আলুর বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখি। আমাদের দেশে যে জি.এম. আলুর কথা বলা হচ্ছে তা হবে নাকি উচ্চ প্রোটিনওয়ালা, আর তাতে থাকবে রাতকানা রোগ প্রতিরোধের গুণ। উদ্দেশ্য এই আলু ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানো। কিন্তু এই জি.এম. শস্যগুলো তৈরি হয় শস্যের মধ্যে ব্যাকটিরিয়া, নিমাটোড ইত্যাদির জিন ঢুকিয়ে। তার প্রভাব বহু বছর ধরে পরিবেশে এবং সমাজে পরীক্ষিত হয়ে ওঠেনি। তাই হুট করে তার ব্যবহার বড় ক্ষতি করে দিতে পারে। উন্নত দেশগুলো সেই পরীক্ষাটা তৃতীয় বিশ্বে করে নিতে চাইছে। আলু যে 'সালমোনেলা' পরিবারের উদ্ভিদ সেই একই পরিবারের 'বিষ কাঁটালি' সহ অনেক বিষাক্ত উদ্ভিদও রয়েছে। তাই তার পরীক্ষা পর্ব না মিটিয়ে ছাত্রদের মুখে তুলে দেওয়া যায় না। তাছাড়া ডাল, সয়াবিন, গম দিয়ে যা পেতে পারি তা আলুর মধ্যে একজায়গায় ভরতে হবে কেন? খাবার বৈচিত্র্য যত থাকবে ততই শরীরের প্রয়োজনীয় সব উপাদান সহজে শরীর পেয়ে যাবে। এর সঙ্গে মনে রাখা দরকার জি.এম আলুর সব গবেষণা এখনো অবধি ফসলটার উৎপাদনের দিকেই রয়েছে। আলুটির জিন পরবর্তী প্রজন্মেও স্থিতিশীল কিনা তার পরীক্ষা দরকার। কারণ আলু ফুল-ফল থেকে বীজ হয় না। বীজ হয় আলুটিরই অংশ। তাই পরের প্রজন্মের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত নয়। নতুন জিনটিকে আলুটির জিনের অঙ্গীভূত হয়ে যেতে হবে।

এতসব কথার মাঝ্যে মনে রাখা হবে জি.এম. প্রযুক্তি প্রাথমিক সুবিধাটুকু যায় বীজ কোম্পানিগুলোর কাছে, মানুষের কাছে নয়। আর সেই বীজ কোম্পানিগুলোর অধিকাংশই মার্কিন বহুজাতিক। তৃতীয় বিশ্বের কৃষি, খাদ্যসুরক্ষা ও বীজের অধিকার এভাবেই তারা দখল করতে চাইছে।

বর্জ্য ফেলার মাঠ আন্তর্জাতিক আঙিনা আর তৃতীয় বিশের দেশ

উন্নত দেশগুলোর আর একটা বড় পরিবেশগত অপরাধ হল তাদের বর্জ্য অন্যত্র চালান করা। নিউ সায়েন্সিস্ট পত্রিকায় এক নিবন্ধে দেখা যায় এই বর্জ্যের মধ্যে ফ্লাই - অ্যাশ থেকে পারদঘটিত বর্জ্য যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যও। ১৯৮২ সাল অবধি প্রশান্ত মহাসাগরে যত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ফেলা হয়েছে তার ৯৭ ভাগই ফেলেছে আমেরিকা। উত্তর আটলান্টিকে ফেলা মোট তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের ৭৭ ভাগই ব্রিটেনের। কখনো কলোরাডোর ইউরেনিয়াম খনি থেকে গ্যাবনে পাঠানো হয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য। পারদ বর্জ্য পাচার হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। ইউরোপের আর উত্তর আমেরিকার শিল্প বর্জ্যের ডাস্টবিন হয় বেনি। আমেরিকার ফ্লাই - অ্যাশ ঘাড়ে চাপে লাতিন আমেরিকার। উন্নত দেশগুলোর এই পরিবেশ - মস্তানি আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংবেদনশীলতার অন্তরায়।

তাদের স্বার্থে যুদ্ধ, অথচ বিনষ্ট হয় আমাদের পরিবেশ

পুঁজি, ব্যবসা, মালিকদের স্বার্থ আর অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধে যায় উন্নত দেশগুলো। বিস্তৃত আলোচনার জায়গা এখানে নেই, কিন্তু একথা স্মরণে আনা অন্যায় হবে না, প্রথম পরমাণু বোমা ফেলে লাখো প্রাণ ও পরিবেশ ধ্বংসের প্রধান অপরাধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই। আজও জাপানের বহু মানুষ হিবাকুশা। তারাই প্রথম অপারেশন র‍্যানচ্ হ্যান্ড নামে লক্ষ লক্ষ টন এজেন্ট অরেঞ্জ ডাই অকিসনের মতো রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল ভিয়েতনামে। তার ফলে ভিয়েতনামের মায়েরা আজও বিকালঙ্গ আর মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্ম দেন। জিন-এর প্রভাবে অসংখ্য মানুষ এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে তারা বহু প্রজন্ম ধরে এই বিপদ বয়ে বেড়াবেন। ক্যানসারে মৃত্যু ঘটেছে অনেক, ঘটছে আজও। আর এখানকার বিপুল বন ধ্বংস হয়েছে ঐ রাসায়নিকে। এসবের দায় কে নেবে?

সম্প্রতি ৯/১১ -র ঘটনার পর ব্যাপকতম বোমা পড়েছে আফগানিস্তানে। ফেলেছে আমেরিকান জোট। পড়েছে ডিপ্লেটেড ইউরোনিয়াম লাগানো বোমা। ঐ বোমায় থাকা ইউরেনিয়ামের অবশেষ বহু বছর ধরে নিজে সক্রিয় থেকে এবং অন্য ধাতুদের সক্রিয় করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তেজস্ক্রিয় দূষণকে বজায় রেখে যাবে। আক্রান্ত হবে মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, ক্যানসার, লিউকোমিয়া কতশত বছর নিত্যসঙ্গী হবে বাসিন্দাদের কে জানে!

সর্বশেষে উদাহরণ ইরাক। দেশটাকে বোমায় গুড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকান জোট রাষ্ট্রসংঘের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই। প্রাচীন সভ্যতার সব নিদর্শন নষ্ট করেছে, লুঠ করেছে। আর আজকে জানা যাচ্ছে ওখানে তারা বাবহার করেছে রাসায়নিক অস্ত্র 'সাদা ফসফরাস'। যা শরীরে এসে চামড়া থেকে হাড় পর্যন্ত পুরো অংশটা গলিয়ে দিয়েছে মানুষের।

পরিবেশের দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরই

তাই পরিবেশ আজ উন্নত দেশগুলোর হাতে সুরক্ষিত নয়। পরিবেশকে কলুষময় করেছে তারাই। তাদের কাছ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে মানুষকে। আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উন্নয়ন, খাদ্যসুরক্ষা, বিল্পায়ন, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা দরকার। আর দরকার শক্তিশালী তৃতীয় বিশ্ব জোট গড়া। অন্যথায় আন্তর্জাতিক সভাগুলোতে উত্তরের দেশগুলোর জারিজুরি ঠেকানো অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ রাজনীতি আমাদের সচেতন করুক পরিবেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করুক নতুন করে।